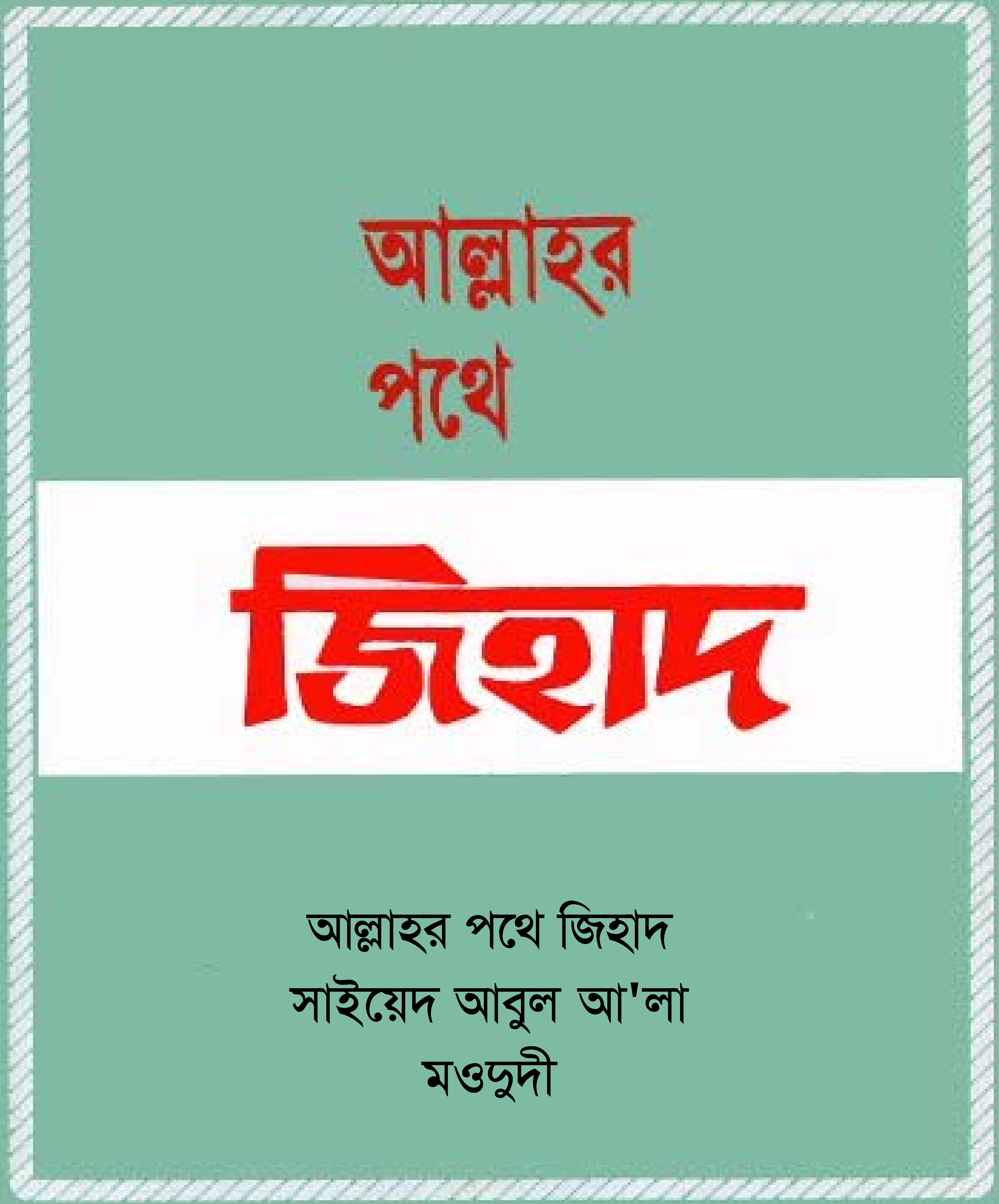

আল্লাহর
পথে
জিহাদ

আল্লাহর পথে জিহাদ
সাইয়েদ আবুল আ'লা
মওদুদী

আল্লাহর পথে জিহাদ

[এটি মাওলানা মওদূদীর একটি ভাষণ। ১৯৩৯ সালের ১৩ই এপ্রিল 'ইকবাল দিবস' উপলক্ষে লাহোর টাউন হলে মাওলানা এ ভাষণ প্রদান করেন।]

সাধারণত ইংরেজি ভাষায় জিহাদ শব্দটির অনুবাদ holy war (পবিত্র যুদ্ধ) করে মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়। দীর্ঘকাল যাবত এই শব্দটির যেরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তার ফলে ইহা এখন 'উন্মাদনা' বা 'পাগলামীর' প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে। এই শব্দটি শ্রুত হওয়ার সংগে সংগেই শ্রোতার কল্পনা দৃষ্টিতে এমন এক ভয়ংকর ও বিভীষিকাময় দৃশ্য ভেসে উঠে যে, ধর্মপাগলের একটি দল যেন নগ্ন তরবারি হস্তে, শ্মশ্রু উত্তোলন করে রক্ত পিপাসু চোখে 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে আর কাফেরদের পাওয়া মাত্র গ্রেফতার করছে এবং তাদের গর্দানে তরবারি রেখে বলছেঃ 'কালেমা পড়' নতুবা এক্ষুণি গর্দান দ্বিখণ্ডিত করা হবে। শঠ লেখকগণ বিশেষ চাতুর্যের সাথে আমাদের এরূপ চিত্র অংকিত করছে এবং তার সাথে এ মন্তব্যটি জুড়ে দিয়েছে "রক্তের গন্ধ আসে এ জাতির ইতিহাস হতে।"

মজার ব্যাপার এই যে, আমাদের এই চিত্র যারা অংকিত করেছে, তারা নিজেরাই বিগত কয়েক শতাব্দীকাল যাবৎ মারাত্মক অপবিত্র যুদ্ধে (unholy war) লিপ্ত রয়েছে। তাদের চরিত্র অত্যন্ত বীভৎস। তারা সম্পদ ও শক্তির লোভে সকল প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিতান্ত দস্যুর ন্যায় সমগ্র পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা সর্বত্র ব্যবসায়ের বাজার, কাঁচামালের সম্ভার, উপনিবেশ স্থাপনের উপযোগী অঞ্চল এবং মূল্যবান দ্রব্যের খনির সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে। লালসার আগুনের ইন্ধন সংগ্রহ করে এটাকে চির প্রজ্বলিত করে রাখাই হলো তাদের লক্ষ্য। লালসা ও লোভের পংকিল পথেই তাদের সকল চেষ্টা নিয়োজিত। তাদের দৃষ্টিতে কোনো দেশে বিপুল খনিজ সম্পদ বর্তমান থাকা কিংবা প্রচুর কাঁচামাল উৎপন্ন হওয়াই তার উপর প্রচন্ড বিক্রমের সাথে তাদের আক্রমণ করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। এমন কি, তাদের নিজ দেশে উৎপন্ন ব্যবসায় পণ্য বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথাও পরিলক্ষিত হলে অথবা তাদের অতিরিক্ত জনসংখ্যা সে দেশে প্রেরণ করা সম্ভব হলে সে দেশের উপর অনায়াসেই তারা আক্রমণ চালাতে পারে। আর কিছু না হলেও তাদের অধিকৃত কিংবা অধিকার করতে ইচ্ছুক এমন কোনো দেশে যাওয়ার পথে অপর কোনো দেশের অবস্থানও উহার আক্রান্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। বলা বাহুল্য, আমরা যা কিছু করেছি তা অতীতের ইতিহাস ; কিন্তু তাদের এ কীতিকলাপ তো অত্যাধুনিক। সাম্প্রতিক কালের প্রত্যেকটি দিন ও রাত্রই বিশ্ববাসীর চোখের সম্মুখেই তাদের কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা, ভূ-মণ্ডলের কোনো একটি অংশও এই লালসা পঙ্কিল যুদ্ধ লিপ্সু জাতির অপবিত্র আক্রমণের আঘাত হতে রক্ষা পাচ্ছে না। তথাপি তাদের চতুরতা বড়ই প্রশংসনীয়। কারণ তারা আমাদের চিত্র এতোখানি ভয়ানক ও বিভীষিকাপূর্ণ করে তুলে ধরেছে যে, তাদের নিজস্ব কদর্য চিত্র উহার অন্তরালে লুকিয়ে গিয়েছে।

পক্ষান্তরে আমাদের সরলতাও কম প্রশংসার যোগ্য নয়। শত্রুপক্ষ কর্তৃক অংকিত আমাদের চিত্র দেখে আমরা এতোদূর ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি যে, উহার পশ্চাতে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্বয়ং চিত্র নির্মাতাদের চেহারাটি দেখার কথা পর্যন্ত একদম ভুলে বসেছি। উপরন্তু আমরা কাতর কণ্ঠে ও অনুতাপের সুরে বলতে শুরু করেছিঃ "হুযুর যুদ্ধ ও প্রাণ-নাশের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। আমরা তো বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পাদ্রির ন্যায় শান্তিপ্রিয় ধর্ম প্রচারক মাত্র। নির্দিষ্ট কয়েকটি বিশ্বাসের প্রতিবাদ এবং তদস্থলে অপর কয়েকটি আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও লোকদের তা মেনে নিতে বলাই আমাদের কাজ। তরবারির সংগে তো আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অপরাধ কখনো কখনো হয়ত আমরা করে ফেলেছি। কিন্তু বর্তমানে তা হতেও তওবা করেছি ; এমনকি, হুযুরের অস্বস্তির জন্য 'তরবারির যুদ্ধকে' সরকারিভাবে বাতিল করেও দেয়া হয়েছে। এখন শুধু মুখ ও লেখনির মারফতে ধর্ম প্রচারেরই নাম হচ্ছে জিহাদ ; কামান, বন্দুক ও গোলা-বারুদ ব্যবহার করা সরকারের কাজ, মুখ ও লেখনি প্রয়োগই হচ্ছে আমাদের একমাত্র উপায়।"

জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার কারণ

শুধু রাজনৈতিক কূটকৌশলের পরিণামেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যেসব কারণে আল্লাহর পথে জিহাদ এর নিগূঢ় তত্ত্ব দুরূহ হয়ে পড়েছে, বৈজ্ঞানিক পন্থায় তা যাচাই করলে তাতে দুইটি প্রধান ও মৌলিক ভুল ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথম ভুল ধারণা এই যে, ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় সাধারণত যে অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয় তদনুযায়ী নিছক একটি ধর্ম বলে মনে করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ভুল ধারণা এই যে, মুসলমানদেরকে অন্যান্য জাতির ন্যায় সাধারণত যে অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয় তদনুযায়ী একটি জাতিই মাত্র মনে করা হয়েছে।

এই দুইটি ভ্রান্তধারণা কেবল জিহাদের ব্যাপারটি নয় সামগ্রিকভাবে গোটা ইসলামের রূপকেই পরিবর্তিত ও বিকৃত করে দিয়েছে। এবং মুসলমানদের স্থান ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলেছে।

সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী ধর্ম বলতে কতকগুলি আকিদা-বিশ্বাস ও কয়েকটি ইবাদত-অনুষ্ঠানের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই বুঝা যায় না। এ অর্থের দিক দিয়ে ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা নিঃসন্দেহ। এমতাবস্থায় যে কোনো আকিদা মনে স্থান দেয়া, মন যার ইবাদত করতে ইচ্ছুক তারই ইবাদত করা যেভাবে ইচ্ছা তাকে ডেকে প্রভৃতি কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তিই লাভ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট ধর্মের জন্য খুব বেশি দরদ ও প্রেমবোধ করলে পৃথিবী ব্যাপী নিজ আকিদার প্রচার করা এবং অন্যান্য আকিদাপন্থীদের সাথে ‘বিতর্ক ও বাহাস’ করার স্বাধীনতাও তার রয়েছে। এতোটুকু কাজের জন্য তরবারি ধারণ করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? লোকদের মারধোর করে তো কোনো আকিদার প্রতি বিশ্বাস জন্মানো যায় না। বস্তুত ইসলামকে সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী একটি ‘ধর্ম’ হিসেবে মেনে নিলে এবং মূলত ইসলাম তা হলে প্রকৃতপক্ষে জিহাদের সমর্থনে কোনো সংগত যুক্তিই পেশ করা যেতে পারে না।

অনুরূপভাবে ‘জাতি’ বলতে সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট কতগুলো লোকদের এমন একটি সমষ্টি (a homogeneous group of men) বুঝায়, যারা কয়েকটি মৌলিক ব্যাপারে অংশীদার হওয়ার কারণে একত্রিত এবং অন্যান্য সমষ্টি হতে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে মানব সমষ্টি একটি জাতির মর্যাদা পাবে মাত্র দু’টি কারণেই তাদের পক্ষে তরবারি ধারণ করা সংগত হতে পারে। একঃ তাদের ন্যায়সংগত অধিকার হরণ করার জন্য কেউ তাদের উপর আক্রমন করলে। দুইঃ তারা নিজেরাই অপরের ন্যায়সংগত অধিকার কেড়ে নেবার জন্য আক্রমণ করতে চাইলে। প্রথম অবস্থায় তরবারি ধারণের কিছু না কিছু নৈতিক বৈধতা রয়েছে (যদিও কোনো কোনো ধর্মাত্মার দৃষ্টিতে এটাও পাপ), কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটিকে চরম ডিকটেটর ছাড়া অপর কেউ বৈধ বলে দাবি করতে পারে না। এমনকি ফ্রান্স ও বৃটেনের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যের কূটনীতিকরাও এটাকে সংগত বলার দুঃসাহস করবে না।

জিহাদের তত্ত্ব কথা

অতএব ইসলাম যদি ‘ধর্ম’ মাত্র হয়ে থাকে এবং মুসলমান যদি নিছক একটি ‘জাতি’ হয় তবে জিহাদ কিছুতেই ‘সর্বোত্তম’ ইবাদত হতে পারে না, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এটার অর্থহীনতা ও অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এটা সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুত ইসলাম কোনো ‘ধর্ম’ এবং মুসলমান কোনো জাতির নাম নয়। ইসলাম একটি বিপ্লবী মতাদর্শ। সমগ্র পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থার (social order) আমূল পরিবর্তন সাধন করে তার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী নতুন করে তা ঢেলে গঠন করাই ইসলামের চরম লক্ষ্য। আর ‘মুসলমান’ একটি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দল (international revolution Party) বিশেষ, ইসলামের বাঞ্ছিত কার্যসূচী বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই তাদের সংঘবদ্ধ করা হয়েছে। আর এ উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য ইসলামী দলের বিপ্লবী চেষ্টা-সাধনা ও চূড়ান্ত শক্তি (revolutionary struggle) প্রয়োগের নামই হচ্ছে ‘জিহাদ’।

অন্যান্য বিপ্লবী মতাদর্শের ন্যায় ইসলামও সাধারণভাবে প্রচলিত শব্দ পরিত্যাগ করে নিজস্ব একটি পরিভাষা (terminology) ব্যবহার করেছে। ফলে তার বিপ্লবী ধারণা প্রচলিত সাধারণ ধারণা হতে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

‘জিহাদ’ শব্দটি এ বিশেষ পরিভাষার অন্যতম। ‘হারব’ (যুদ্ধ) বা এ অর্থবোধক অন্য কোনো আরবি শব্দই ইসলাম স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই প্রয়োগ করেনাই, এর পরিবর্তে ব্যবহার করেছে ‘জিহাদ’। ইহা struggle (সংগ্রাম) এর সমার্থবোধক, বরং এটার আধিক্যের অর্থ জ্ঞাপক। ইংরেজিতে এটার মর্মার্থ হতে পারে to exert one’s utmost endeavour in promoting a cause অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা।

কিন্তু পুরাতন ও সাধারণ প্রচলিত শব্দ ত্যাগ করে এ নতুন শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো? এর একমাত্র উত্তর এই যে, ব্যক্তি কিংবা দলসমূহের পংকিল স্বার্থ উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও সাম্রাজ্যগুলো যেসব যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড করেছে, ‘যুদ্ধ’ শব্দটি তা বুঝার জন্য চিরদিন ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এসব যুদ্ধের লক্ষ্য হয় ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধি। তাতে কোনো মতাদর্শ অথবা কোনো নিয়ম-নীতির সমর্থন ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মোটেই থাকে না। কিন্তু ইসলামের যুদ্ধ এধরনের নয় বলে গোড়াতেই এ শব্দটি ব্যবহার করেনাই। বিশেষ কোনো জাতির লাভ বা ক্ষতি সাধন এর লক্ষ্য নয়। দেশের উপর কোন্ শাসকের শাসন চলবে সে বিষয়েও এর ভ্রুক্ষেপ নেই। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শুধু মানবতার কল্যাণ সাধন। এ কল্যাণের জন্য ইসলাম একটি বিশেষ আদর্শ এবং বাস্তব কর্মসূচী পেশ করেছে। এ নীতি ও মতাদর্শের বিপরীত যেখানেই যে হুকুম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ইসলাম সেটাকে নির্মূল করতে চায় তা যে জাতি বা দেশেই হোক না কেন। ইসলাম তার নিজস্ব আদর্শ ও কর্মসূচী অনুযায়ী নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় কে তার পতাকা বহন করছে, আর কার শাসন কতৃ©ত্বের উপর উহার চরম আঘাত পড়ে, সেদিক দিয়ে কোনো পার্থক্যই করা হয়না। ইসলাম চায় পৃথিবী, পৃথিবীর কোনো অংশ নয়। সমগ্র ভূ-মন্ডলই ইহার লক্ষ্য। কিন্তু বিশেষ কোনো জাতি বা বহু জাতির হাত হতে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া অন্য কোনো বিশেষ জাতির হাতে তুলে দেয়া ইসলামের লক্ষ্য নয়। এর একমাত্র লক্ষ্য এই যে, গোটা মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য তার যে মতাদর্শ ও কর্মসূচী রয়েছে যার নাম হচ্ছে ইসলাম সমগ্র বিশ্বমানবকে তার দ্বারা পরিতৃপ্ত ও ঐশ্বর্যমন্ডিত করে তুলতে হবে। এ মহান উদ্দেশ্যে বিপ্লব সৃষ্টির অনুকূলে ইহা সমগ্র কার্যকর শক্তিকেই প্রয়োগ করতে চায়।

এভাবে সমস্ত শক্তি প্রয়োগের সমষ্টিগত নামই হচ্ছে ‘জিহাদ’। মুখের ভাষা ও লেখনির সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগিতে পরিবর্তন করা এবং তাদের মধ্যে ‘অন্তর্বিপ্লব’ সৃষ্টি করাকেও জিহাদ বলা যায়। তরবারি (শক্তি) ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা নির্মূল করে নবতর সুবিচারমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাকেও জিহাদ বলা হয়। এপথে ধন মাল ব্যয় করা, শারীরিক শক্তি সামর্থ নিয়োগ করাও জিহাদ।

জিহাদ আল্লাহর পথে

মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের জিহাদ শুধুমাত্র ‘জিহাদই’ নয়, এই জিহাদ হবে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর পথে। ‘আল্লাহর পথে’ কথাটি ইহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ শব্দ দু’টি ইসলামের বিশেষ পরিভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য ‘আল্লাহর পথে’ কথা দ্বারা অনেক লোকের মনে এক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তারা মনে করে যে, মানুষকে জোরপূর্বক ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসের অনুসারী করে তোলাই বুঝি আল্লাহর পথে জিহাদ। সংকীর্ণমনা লোকেরা ‘আল্লাহর পথে’ কথাটির এই বিকৃত অর্থই গ্রহণ করেছে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো অর্থই তাদের মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সামাজিক কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে যে কাজই করা হবে, তার নিয়ত যদি কোনো বৈষয়িক স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করা না হয়, বরং আল্লাহর সন্তোষ লাভই যদি তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়, তবে ইসলাম এ সকল কাজকে ‘আল্লাহর পথে’ বলে ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ দান-খয়রাতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো বৈষয়িক কিংবা নৈতিক স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করলে তা ‘আল্লাহর পথে’ হবে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার উদ্দেশ্যে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য করা হলে ইহা নিশ্চয়ই ‘আল্লাহর পথে’ হবে। অতএব পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে সকল প্রকার স্বার্থবাদের উর্ধ্বে থেকে যে কোনো কাজই করা হবে এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হবে যে, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করাই হচ্ছে আল্লাহর সন্তোষ লাভের একমাত্র উপায়, আর বিশ্ব-স্রষ্টার সন্তোষ লাভ ভিন্ন মানব জীবনের আর কিছু লক্ষ্যও হতে পারে না- ইহার প্রত্যেকটি কাজকেই ‘আল্লাহর পথে’ বলে ঘোষণা করা যাবে।

বস্তুত জিহাদের পূর্বেও ‘আল্লাহর পথে’ শর্তটি এ জন্যই যুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, কোনো ব্যক্তি কিংবা দল যখন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধন অথবা ইসলামী মতাদর্শ অনুযায়ী নব বিধান প্রণয়ন করতে অগ্রসর হবে, তখন তার এই প্রচেষ্টায় ও আত্মদানে ব্যক্তিগত স্বার্থলাভ তার লক্ষ্য হতে পারবে না। ‘কাইজার’কে বিতাড়িত করে সে নিজেই যেন ‘কাইজার’

সাজবার ইচ্ছা পোষণ না করে। নিজের জন্য ধন-মাল, খ্যাতি-প্রসিদ্ধ, মান-সম্মান, কোনো কিছু লাভ করাই যেন তার চেষ্টা-শ্রমের মূল লক্ষ্য না হয়। তার সমস্ত কুরবানী ও শ্রম-সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে মানবসমাজে এক সুবিচার পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা। এতদ্ভিন্ন তার কোনো উদ্দেশ্যই থাকবে না। কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

‘ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর পথে লড়াই করে, কাফেরগণ লড়াই করে তাগুতের পথে।’ (সূরা আন নিসাঃ ৭৬)

‘তাগুত’ শব্দের মূল হচ্ছে ‘তুগইয়ান’ ইহার অর্থ সীমা লংঘন করা। নদীর পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে যখন ইহার সীমা অতিক্রম করে, তখন বলা হয় নদীতে ‘তুগইয়ানী’ (প্লাবন) এসেছে। মানুষ যদি নিজের সংগত সীমা অতিক্রম করে অন্য মানুষের ‘খোদা’ (সার্বভৌম) হবার জন্য কিংবা অতিরিক্ত স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নিজের শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তবে এটাকেই বলা হয় ‘তাগুতের পথে সংগ্রাম’। ‘আল্লাহর পথে’ সংগ্রাম এটার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার চরম লক্ষ্য হবে পৃথিবীতে আল্লাহর সুবিচারমূলক আইন প্রতিষ্ঠিত করা। সংগ্রামী ব্যক্তি নিজেও ইহা পালন করার জন্য চেষ্টা করবে এবং অন্যকেও ইহা পালন করানোর চেষ্টা করবে। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ

‘পারলৌকিক সম্মান ও মর্যাদা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা পৃথিবীতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায় না। বস্তুত পারলৌকিক সাফল্য এধরনের পরহেযগার লোকদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।’ (সূরা আল কাসাসঃ ৮৩)

হাদিসে উল্লেখিত হয়েছেঃ “এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলো, ‘আল্লাহর পথে যুদ্ধের’ অর্থ কি? এক ব্যক্তি ধন সম্পদের জন্য যুদ্ধ করে অপর ব্যক্তি বীরত্বের খ্যাতি লাভ করার জন্য যুদ্ধ করে, আর তৃতীয় ব্যক্তি শত্রুতা সাধনের জন্য কিংবা জাতির গৌরব অহংকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে। ইহাদের মধ্যে কার যুদ্ধ ‘আল্লাহর পথে’ হচ্ছে?”

হযরত (সা) উত্তরে বললেনঃ “এদের কারো যুদ্ধই ‘আল্লাহর পথে’ নয়। যে ব্যক্তি কেবল ‘আল্লাহর বিধান’ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করবে, শুধু তার যুদ্ধই ‘আল্লাহর পথে’ হবে।” অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছেঃ “যদি কেহ যুদ্ধ করে আর উট বাঁধবার একগাছ রশি লাভ করাও তার ‘নিয়ত’ হয় তবে সে কোনো ফল লাভ করতে পারবেনা। যে কাজ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য হবে, আল্লাহ শুধু তাই কবুল করবেন। অবশ্য যদি তার কোনো ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত স্বার্থ লাভ উদ্দেশ্য না থাকে।”

অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদের সঙ্গে ‘আল্লাহর পথে’ একটি অপরিহার্য ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। নিছক যুদ্ধ তো পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবই করছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য লাভের জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা করছে। কিন্তু মুসলমান একটি বিপ্লবী দলের নাম ; জীবন ও ধন-মাল প্রয়োগ করে দুনিয়ার সকল আল্লাহদ্রোহি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং এতদুদ্দেশ্যে দেহ ও আত্মার সকল শক্তি নিযুক্ত করা ইসলামের বিপ্লবী মতাদর্শের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু তা প্রতিষ্ঠিত আল্লাহদ্রোহিদের বিচ্যুত করে নিজেই তাদের স্থান দখল করার জন্য নয়। বরং এজন্য যে, পৃথিবীর বুক হতে আল্লাহদ্রোহিতার (সীমালংঘন) মূলোৎপাটন করা এবং সর্বত্র একমাত্র আল্লাহর আইন চালু করা বিশ্বমানবতার নিরাপত্তার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

অতপর আমি ইসলামের বিপ্লবী আহ্বানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করতে চাই। এ আলোচনা দ্বারা জিহাদের অপরিহার্যতা এবং এর মূল লক্ষ্য (ড়নলবপঃরাব) সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যাবে।

ইসলামী বিপ্লবের আহ্বান

ইসলামের বিপ্লবী আহ্বান নিম্নলিখিত আয়াতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছেঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

‘হে মানুষ তোমাদের সেই ‘রব’ এর দাসত্ব কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।’ (সূরা আল বাকারাঃ ২১)

ইসলাম এখানে মজুর, জমিদার, কৃষক কিংবা কারখানার মালিক প্রভৃতি কোনো এক বিশেষ শ্রেণীকে আহ্বান জানায়নি। বরং ইসলামের ডাক সমস্ত মানুষের প্রতি। ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবেই আহ্বান জানিয়েছে। এর নির্দেশ শুধু এতোটুকু যে, তোমরা যদি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুসরণ করতে থাকো তবে তা পরিত্যাগ কর। তোমাদের নিজেদের মধ্যে প্রভুত্ব লাভের লিপ্সা থাকলে তাও দূর কর। কারণ অন্য লোককে নিজের দাস বানাবার কিংবা কাউকেও নিজের সম্মুখে মাথা নত করতে বাধ্য করার কোনো অধিকারই তোমাদের কারো নেই। তোমাদের সকলকে একই আল্লাহর দাসত্ব কবুল করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর ব্যাপারে তোমাদের সকলকে একই স্তর ও শ্রেণীভুক্ত হতে হবে।

أَلاَّ وَبَيْنَكُمْ بَيْنَنَا سَوَاء كَلَمَةٍ إِلَى تَعَالَوْاْ يَتَّخِذَ وَلاَ شَيْئًا بِهِ نُشْرِكَ وَلاَ اللّهَ إِلاَّ نَعْبُدَ اللّهِ دُونِ مِّن أَرْبَابًا بَعْضاً بَعْضُنَا

‘আসো তোমরা ও আমরা এমন একটি কথায় একমত হই যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমভাবে গ্রহণযোগ্য। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবো না, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে কাউকেও আল্লাহর অংশীদার বলে মনে করবো না। পরন্তু আমাদের মধ্যে কাউকেও আল্লাহর পরিবর্তে আদেশ-নিষেধ দানের অধিকারী বলেও মানবো না।’ (সূরা আল ইমরানঃ ৬৪)

বস্তুত ইহা সর্বাত্মক ও নিখিল বিশ্বব্যাপী এক বিপ্লবের আহ্বান। ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছেনঃ ان الحكم الا لله .

‘হুকুম দেয়ার কিংবা প্রভুত্বের অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারই থাকতে পারেনা।’

কোনো মানুষ নিজেই অন্য মানুষের শাসক ও নিয়ামক হতে পারে না, নিজ ইচ্ছামত কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং কোনো কাজ হতে নিষেধ করারও কোনো অধিকার কারও নেই। কারণ, কোনো মানুষকে সার্বভৌম প্রভু ও স্বাধীনভাবে আদেশ-নিষেধের অধিকারী মনে করার অর্থই হচ্ছে সকল বিপর্যয়ের মূল উৎস। মানুষকে আল্লাহ তা’য়ালা যে নির্ভেজাল প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন-যাপনের যে সহজ-সরল ব্যবস্থা দান করেছেন মানুষ তা হতে ঠিক তখনই বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয় যখন সে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং ফলত নিজকে, নিজের সত্তাকেও ভুলে বসে। ইহারই অনিবার্য পরিণামে মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক কিংবা পরিবার অথবা শ্রেণী গোপনে কিংবা প্রকাশ্যভাবে খোদায়ী লাভ করবার দাবি উত্থাপন করে এবং নিজের সকল শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায় ও অসংগত উপায়ে অন্য মানুষকে নিজেদের দাসানুদাসে পরিণত করে। অপর দিকে এই আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ও আত্মবিস্মৃত হওয়ার ফলেই মানব সমাজের এক বিরাট অংশ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রশক্তিগুলোর নিরংকুশ প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয় এবং এদের প্রত্যেকটি হুকুম নত শিরে পালন করবে বলে নিশ্চয়তা দান করে। বস্তুত বিশ্বব্যাপী যাবতীয় অত্যাচার, যুলুম, বিপর্যয়, শোষণ ও দুর্নীতির মূল কারণ এটাই। এজন্যই ইসলাম সর্বপ্রথম এরই উপর আঘাত হানে এবং জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেঃ

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ - الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

‘যারা সীমালংঘন করে, পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং কোনরূপ সংস্কার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে না তাদের কোনো হুকুমই তোমরা মানিও না।’ (সূরা আশ শুআরাঃ ১৫১-১৫২)

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

‘যার মনকে আমার স্মরণ হতে গাফেল করে দিয়েছে, নিজের নফসের খাহেশ- লালসারই যে দাস হয়ে গিয়েছে এবং যার শাসন-কর্তৃত্ব সীমালংঘনকারী, তোমরা আদৌ তার আনুগত্য করিও না।’ (সূরা আল কাহাফঃ ২৮)

أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ - الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا

‘আল্লাহর নির্ধারিত সরল জীবন ব্যবস্থায় যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাকে জটিল ও বক্র করে তুলতে চেষ্টা করে তারা যালেম এবং এ যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।’ (সূরা হূদঃ ১৮-১৯)

ইসলাম লোকদের ডেকে জিজ্ঞাসা করেঃ

ءارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار

অর্থাৎ যেসব ছোট-বড় খোদার দাসত্ব করে তোমরা নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত হচ্ছো তাদেরই দাসত্ব গ্রহণীয়, না একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর দাসত্ব? এক আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ না করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ‘খোদাদের’ দাসত্ব-শৃংখল হতে মুক্তি পাওয়া কখনও সম্ভব নয়। যে কোনো প্রকারে এরা তোমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে থাকবে।

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

এই বাদশাগণ যখন কোনো এলাকায় প্রবেশ করে তখন সেখানকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে এবং সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে। বস্তুত ইহাই তাদের চিরন্তন স্বভাব। (সূরা আন নামলঃ ৩৪)

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ

‘এই ধরনের লোকেরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারলে পৃথিবীতে ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, শস্যক্ষেত ও অধস্তন বংশধরদের বিনাশ করে। আল্লাহ তা’য়ালা বিপর্যয় ও ধ্বংসাত্মক কাজ-কর্ম আদৌ পছন্দ করেনা।’ (সূরা আল বাকারাঃ ২০৫)

বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ এখানে নেই। সংক্ষেপে আমি একথাই বুঝাতে চাই যে, ইসলামের তাওহীদ ও ‘খোদাবাদের’ আহ্বান অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় নিছক ধর্মীয় আমন্ত্রণই নয়। বরং ইহা এক সর্বাত্মক সমাজ-বিপ্লবের (social revolation) ডাক। সমাজে যারা ধর্মের ক্ষেত্রে পুরোহিত, রাজনীতির দিক দিয়ে বাদশাহ, নেতা, শাসক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহাজন, জমিদার ও ইজারাদার সেজে জনগণকে নিজেদের দাস বানিয়ে নিয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই উপর ইসলামের এই বিপ্লবী দাওয়াতের প্রত্যক্ষ ও প্রচন্ড আঘাত পড়ে। কারণ এরা কোথাও প্রকাশ্যভাবে ‘খোদা’ হয়ে বসেছে আর কোথাও নিজেদের জন্মগত কিংবা শ্রেণীগত অধিকারের ভিত্তিতে জনগণের আনুগত্য লাভের দাবি করছে, এরা স্পষ্ট ভাষায় বলেঃ ما لكم من اله غيرى (আমি ভিন্ন তোমাদের কোনো প্রভু নেই) الاعلى انا ربكم (আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব) انا احى واميت (জীবন-মৃত্যুর মালিক আমিই) এবং من اشد مناقوة (আমার তুলনায় অধিক শক্তিশালী আর কে হতে পারে?) আবার কোথাও এরা জনগণের অজ্ঞতা ও মূর্খতা আপন স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কৃত্রিম খোদার মূর্তি ও হাইকাল বানিয়েছে এবং এসবের অন্তরালে এরা লোকদের উপর নিজেদের খোদায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব কুফর, শির্‌ক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইসলামের দাওয়াত এবং এক আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব স্বীকৃতির জন্য ইসলামের প্রচারমূলক কার্যক্রম সরাসরিভাবেই সমসাময়িক সরকার, সরকার সমর্থক কিংবা সরকার আশ্রিত শ্রেণীসমূহের স্বার্থের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। একারণে যখনই কোনো নবী

ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره .

‘হে জাতি, একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব স্বীকার কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো প্রভু ও মাবুদ নেই বলে আহ্বান জানিয়েছেন, সমসাময়িক রাষ্ট্র সরকার তখন তার প্রবল শক্তি সহকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, সকল প্রকার

দুর্নীতিপরায়ণ ও শোষক শ্রেণী তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কারণ ইহা নিছক কোনো অতি-প্রাকৃতিক ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাপারের বিশ্লেষণ (metaphysical proposition) নয়; প্রকৃতপক্ষে এটা ছিলো এক সর্বাত্মক সমাজ-বিপ্লবের উদাত্ত ঘোষণা। এ ঘোষণা কর্ণগোচর হওয়ার সংগে সংগে প্রবল রাজনৈতিক আলোড়নের আভাস পাওয়া যেতো।

ইসলামী বিপ্লবী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ প্রেরিত সকল নবীই যে 'বিপ্লবী' নেতা ছিলেন এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা, এতে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ বিপ্লবী পুরুষ এবং এই আল্লাহ প্রেরিত বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অপরাপর বিপ্লবী নেতা ব্যক্তিগতভাবে যতোই পূণ্যবান ও সৎ হউক না কেন সুবিচার ন্যায়বাদের নির্ভুল আসন তারা কখনই লাভ করতে পারেন না। এরা হয়তো নিজেরাই মযলুম শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন, কিংবা মযলুমের দুঃখ মোচনের উচ্ছ্বসিত আবেগ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ান। ফলে নিজ নিজ শ্রেণীগত দৃষ্টিভংগীর মানদণ্ডেই তারা সমস্ত ব্যাপারে যাচাই করে থাকেন। এর অনিবার্য পরিণাম তাদের দৃষ্টি কখনও নিরপেক্ষ এবং নিখুঁত মানবতাবাদী হতে পারে না; বরং এক পক্ষের প্রতি ক্রোধ ঘৃণা এবং অপর পক্ষের প্রতি সমর্থন সাহায্যের মনোভাব তীব্র ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। তারা অত্যাচারের প্রতিবিধান করার জন্য এমন পন্থা খুঁজে বের করেন যা প্রকৃতপক্ষে আর একটি যুলুমে পরিণত হয়। প্রতিশোধ গ্রহণ, হিংসা-দ্বেষ ও শত্রুতামুলক বিষাক্ত ভাবধারা হতে মুক্ত হয়ে সুস্থ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যযুক্ত এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা নির্ধারণ করা তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না, যাতে সমষ্টিগতভাবে গোটা মানবতা প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারে ; কিন্তু নবীদের কাজ কর্ম এর সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের হয়ে থাকে। তাঁরা যতোই নির্যাতিত, নিস্পেষিত ও নিপিড়ীত হন না কেন, তাঁদের সংগী-সাথীদের উপর যতোই অত্যাচারের ষ্টিম-রোলার চালানো হোক না কেন, তাঁদের পরিচালিত বিপ্লবী আন্দোলনে ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতা কখনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। তাঁরা সরাসরিভাবে আল্লাহর নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে কাজ করতেন। আর আল্লাহ যেহেতু মানবীয় ভাবপ্রবণতার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে, মানুষের কোনো শ্রেণীর সাথে তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক বা আত্মীয়তা নেই, কোনো শ্রেণীর সাথে তাঁর কোনো শত্রুতা বা কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, এজন্য আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন নবীগণ সমস্ত ব্যাপারকে ন্যায়ানুগ ও খাঁটি মানবতাবাদী দৃষ্টিতেই দেখে থাকতেন। যে কাজে সমগ্র মানবজাতির সমষ্টিগত কল্যাণ এমন কি স্বয়ং যালেম শ্রেণীসমূহের জন্যও প্রকৃত মংগল নিহিত রয়েছে, নবীগণ তাই করতেন এবং এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা প্রাণপণে সাধনা করতেন যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের সংগত সীমার মধ্যে থাকতে পারে, ন্যায়সংগত অধিকার লাভ ও ভোগ করতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধ রক্ষা করে চলতে পারে এবং সর্বোপরী ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিপূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য সহকারে স্থাপিত হতে পারে। এ কারণেই নবীদের বিপ্লবী আন্দোলন কখনও শ্রেণী সংগ্রামে (class war) পরিণত হয়নি। তাঁরা এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর উপর প্রতিষ্ঠিত করে সামাজিক পূনর্গঠনের কাজ (social reconstruction) শুরু করে নাই। তাঁরা এমন এক সুসামঞ্জস্য পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যাতে সকল মানুষই বৈষয়িক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং সার্বিক কল্যাণ লাভের সুযোগ সমানভাবে পেতে পারে।

জিহাদের প্রয়োজন ও উহার লক্ষ্য

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপিত সমাজ ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সময়-সুযোগ হলে অন্যত্র তার চেষ্টা করা হবে। এখানে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর মধ্যে থেকে আমি বিশেষভাবে যে কথা বলতে চাই তা এই যে, ইসলাম নিছক একটি ধর্মবিশ্বাস এবং কতকগুলো ইবাদাত অনুষ্ঠানের সমষ্টিমাত্র নয়। মূলত ইসলাম এক পরিপূর্ণ ও ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা। বিশ্ববাসীর জীবনক্ষেত্র হতে সকল প্রকার অত্যাচার ও বিপর্যয়মূলক নিয়ম-নীতি মুলোৎপাট করে তদস্থলে এক পূর্ণাঙ্গ সংস্কারমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করাই এর একমাত্র লক্ষ্য। কারণ মানবতার কল্যাণ ও মংগল বিধানের জন্য তার দৃষ্টিতে এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

এই ভাঙ্গাগড়া এবং বিপ্লব ও সংশোধনের জন্য ইসলাম বিশেষ কোনো জাতিকে আহবান জানায় না। ইহার ডাক হচ্ছে সমগ্র মানবতার প্রতি গোটা মানবজাতি এমন কি স্বয়ং যালেম, শোষক ও দূর্নীতিপরায়ণ জাতি ও শ্রেণীসমূহের প্রতি রাজা, বাদশাহ, সমাজপতি ও নেতৃবৃন্দকে ইসলাম এই বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের আহবান জানায় আর সকলের প্রতিই ইহার

পয়গাম এই যে, সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত সীমার মধ্যেই জীবনযাপন ও যাবতীয় কার্য সম্পাদন কর, তোমরা সত্য ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই তোমাদের জীবনে সর্বাংগীন শান্তি ও নিরাপত্তা সূচিত হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো মানুষের সাথে ইসলামের শত্রুতা নেই, শত্রুতা যুলুমের সাথে, বিপর্যয় ও বিশৃংখলার সাথে, নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের সাথে, আর আল্লাহর নির্ধারিত স্বাভাবিক ব্যবস্থা অনুযায়ী যা একজনের প্রাপ্য নয় তা লাভ করার জন্য কেউ চেষ্টা করলে তার সাথে শত্রুতা রয়েছে।

এ আহবান যারাই গ্রহণ করবে তারা যে কোনো জাতির, বংশের, শ্রেণীর বা দেশেরই লোক হোক না কেন, তারা সকলেই সমান অধিকার ও সমান মর্যাদার ভিত্তিতে ইসলামী দল ও সমাজের সদস্যরূপে গণ্য হবে এবং এরূপে এরাই সেই আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলে রূপান্তরিত হংবে, যাকে কুরআন মজীদ ‘আল্লাহর দল’ নামে অভিহিত করেছে এবং যার অন্য নাম হচ্ছে ইসলামী দল কিংবা মুসলিম উম্মাত।

এই দলটি অস্তিত্ব লাভ করেই স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জিহাদ শুরু করে দেয়। এই দলের বর্তমান থাকাই অনৈসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চূর্ণ করা এবং ইহার পরিবর্তে এক সুবিচারপূর্ণ ও ভারসাম্যযুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা- কুরআন যাকে ‘কালেমাতুল্লাহ’ বলেছে- প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করা অপরিহার্য সাব্যস্ত করে। এই দল যদি রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করে, তবে এর অস্তিত্ব লাভের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ ইহার অন্য কোনো উদ্দেশ্য তো আদৌ ছিলো না। আর উহার অস্তিত্ব টিকে রাখার জন্য এই জিহাদ ভিন্ন অন্য কোনো পন্থাই থাকতে পারে না। কুরআনের ভাষায় এই দলে অস্তিত্ব লাভের একটি মাত্র উদ্দেশ্যই রয়েছে এবং তা এইঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

‘তোমরা সেই সর্বোত্তম জাতি, বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধনের জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ ও ন্যায় কাজের জন্যই লোকদেরকে নির্দেশ দাও। আর অন্যায়, পাপ, মিথ্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কাজ হতে তাদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি তোমরা আস্থা জ্ঞাপন কর।’ (সূরা আলে-ইমরানঃ ১১০)

বস্তুত ইহা কোনো ধর্ম প্রচারক (preachers) ও সুসংবাদ বাহকের (missionaries) দল নয়। মূলত ইহা আল্লাহর সৈন্য বাহিনী মাত্র ;

لتكونوا شهداء على الناس পৃথিবী হতে যুলুম, শোষণ, অশান্তি, চরিত্রহীনতা ও বিপর্যয় এবং সকল প্রকার আল্লাহদ্রোহিতাকে বলপূর্বক নির্মূল করাই তার কতর্ব্য ارباب من دون الله আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা মানুষের রব হয়ে বসেছে, তাদের খোদায়ী প্রভুত্ব চূর্ণ করা এবং অন্যায় ও পাপ বন্ধ করে পুণ্য ও ন্যায়ের প্রচলন করা এ ইসলামী দলের দায়িত্ব। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

قاتلوا هم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله

‘তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতোদিন না অশান্তি ও বিপর্যয় চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করার সুযোগ লাভ করে।’

الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير.

‘তোমরা যদি এ দায়িত্ব পালন না করো তবে সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, ধ্বংস এবং ভাঙ্গন ব্যাপক ও মারাত্মক আকার ধারণ করবে।’

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون . الصف

‘আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে জীবন যাপনের সঠিক পন্থা এবং সত্য অনুসরণের নির্ভুল ব্যবস্থাসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি প্রচলিত সকল প্রকার আনুগত্য অনুসরণ চূর্ণ করে দিয়ে সত্য অনুসরণের এই ব্যবস্থাকে সকলের উপর জয়ী করেন। যদিও আল্লাহর কর্তৃত্বের ব্যাপারে ইহা অংশীবাদীগণ মোটেই পছন্দ করে না।’

অতএব রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করা ছাড়া এ দলের জন্য অন্য কোনো উপায় থাকতে পারে না। কারণ বিপর্যয়মূলক সমাজ ব্যবস্থা আসলে একটি ভারমাস্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার সমর্থন ও সহযোগিতার ফলেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে কোনো সুস্থ, নির্ভুল ও কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থাই কায়েম হতে পারে না, যতোক্ষণ না রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপর্যয়কারীদের হাত হতে সত্যাশ্রয়ী ও সংস্কারবাদীদের হাতে ন্যস্ত হবে।

বিশ্ব সংস্কারের কথা বাদ দিলেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা বিপরীত আদর্শবাদীদের কুক্ষিগত থাকবে। এ দলের পক্ষে নিজের ব্যক্তিগত আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করাও আদৌ সম্ভব নয়। একটি দল যে ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো জীবন ব্যবস্থাকে সত্য ও কল্যাণকর বলে মনে করে সেই ক্ষেত্রে কোনো বিপরীত ধরণের রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কিছুতেই জীবন যাপন করতে পারে না। ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকায় থেকে কোনো কমিউনিষ্টের পক্ষে কমিউনিজমের পূর্ণ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্রশক্তির প্রবল চাপে সেখানকার পুঁজিবাদী জীবনব্যবস্থা স্বতই তার উপর কার্যকর হবে। উহার এই দুর্নিবার চাপ হতে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। অনুরূপভাবে একজন মুসলমানও অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চাইলে কিছুতেই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। যেসব আইন বিধানকে সে বাতিল মনে করে, যেসব কাজ-কর্মকে সে অন্যায় ও অসংগত বলে ধারণা করে, যে ধরনের আচার-আচরণ ও জীবন পদ্ধতিকে সে বিপর্যয়মূলক মনে করে, যে ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি তার দৃষ্টিতে মারাত্মক ইহার প্রত্যেকটি এবং সব ক’টিই তার নিজের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততির উপর প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে। ইহার আক্রমণ হতে সে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। কাজেই বিশেষ কোনো আদর্শ ও আকীদায় বিশ্বাসী লোকেরা স্বভাবত বিরোধী আদর্শের শাসন নির্মূল করে তাদের নিজেদের আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হতে বাধ্য। তা না করলে তারা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করার কোনো সুযোগ পাবে না। এ চেষ্টা না করলে কিংবা এতে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা পরিলক্ষিত হলে নিশ্চিতরূপে মনে করতে হবে যে, মূলত কোনো আদর্শের প্রতিই তাদের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাসের দাবি করলেও তা যে মিথ্যা তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

لَكَ يَتَبَيَّنَ حَتَّى لَهُمْ أَذِنتَ لِمَ عَنكَ اللّهُ عَفَا يَسْتَأْذِنُكَ لاَ - الْكَاذِبِينَ وَتَعْلَمَ صَدَقُواْ الَّذِينَ الآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللّهِ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
يُجَاهِدُواْ أَن يَسْتَأْذِنُكَ إِنَّمَا - .... وَأَنفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ الآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللّهِ يُؤْمِنُونَ لاَ الَّذِينَ

‘হে নবী! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি লোকদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে বিরত থাকার কেন অনুমতি দিলে? তোমার অনুমতি দেওয়া সমীচীন ছিলো না। জিহাদই এমন একটি মাপকাঠি যা দ্বারা তোমাদের খাঁটি ঈমানদার এবং মিথ্যা ঈমানদারদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রমাণিত হতে পারে। বস্তুত যারা আল্লাহ এবং পরকাল বিশ্বাস করে, জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করার দায়িত্ব হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তারা কখনো তোমার নিকট আবেদন করতে পারে না। .... অবশ্য যারা না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, না পরকালের প্রতি, একমাত্র তাহারাই এই জিহাদের কতর্বø হতে বিরত থাকার আবেদন পেশ করতে পারে, অন্য কেহ নয়।’ (সূরা আত-তাওবাঃ ৩৪-৩৫)

এ আয়াতে কুরআন মজীদ সুস্পষ্ট ও অকুণ্ঠ ভাষায় এই নির্দেশ দিয়েছে যে, কোনো দল যে আদর্শ ও মতবাদের প্রতি ঈমান ও আস্থা এনেছে তাকে রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জান ও মালসহ জিহাদে আত্মনিয়োগ করা হচ্ছে তাদের উহার প্রতি সত্যিকার ঈমানদার হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি। বিরোধী আদর্শের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যদি কেও সহ্য করে, তবে তার আদর্শে বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাতে কোনোরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না। এরা স্বাভাবিক পরিণতি এই যে, শেষ পর্যন্ত ইসলামী আদর্শের প্রতি নামকা ওয়াস্তে বিশ্বাসটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। প্রথম দিকে বিরোধী আদর্শের সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সে অত্যন্ত ঘৃণা সহকারেই বরদাশত করতে থাকবে। কিন্তু ধীরে ধীরে মন ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। ফলে ঘৃণা শেষ পর্যন্ত ঐকান্তিক আগ্রহে পরিণত হবে ও সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে সে সাহায্য করতে থাকবে। ইসলামী আদর্শের পরিবর্তে অনৈসলামী আদর্শের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল দ্বারা সে জিহাদ শুরু করবে। এভাবে মুসলমানদেরই শক্তি-ক্ষমতা ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজেই ব্যবহৃত হবে। আর এই চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর এ মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্যই থাকবে না। অবশ্য

তখনো হয়তো মুসলিমদের মুখে ইসলামের মুনাফেকী দাবি একটি নিকৃষ্টতম মিথ্যা ও প্রচারণার শ্লোগান হিসাবে বর্তমান থাকবে। হযরত নবী করীম (সা) এ পরিণামের কথাই স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেনঃ

ولتطرنه على الحق اطراء وليضر بن الله والذى نفسى بيده لتامرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر والتاخذن يد المسئ
لعنهم قلوب بعضكم على بعض او ليلعنكم كما .

‘যে আল্লাহর মুষ্টিতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, তোমাদেরকে সৎ ও ন্যায় কাজ করতে হবে, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখতে হবে এবং পাপী ও অন্যায়কারীর হস্ত ধারণ করে শক্তি প্রয়োগ করে, তাকে সত্যের দিকে ফিরায়ে দিতে হবে অন্যথায় আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী পাপী ও বদকারের প্রভাব তোমাদের মনের উপর এবং শেষ পর্যন্ত তোমরাও তাদের ন্যায় অভিশপ্ত হবে।’

বিশ্ব-বিপ্লব

পূর্বোক্ত আলোচনা হতে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য (objective) বিশেষ কোনো দেশ কিংবা কয়েকটি মাত্র দেশই নয়, বরং সমগ্র দুনিয়ায়ই ইসলাম এ বিপ্লব সৃষ্টি করতে চায়। প্রথমত মুসলিম দলের নিজ নিজ দেশেই রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য, কিন্তু সর্বাত্মক বিশ্ব-বিপ্লব (world revolution) সৃষ্টি করাই তাদের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ লক্ষ্য। বস্তুত যে বিপ্লবী দল জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে গোটা মানবতার কল্যাণের জন্য চেষ্টা করবে তার মূল লক্ষ্য ও কার্যক্রম বিশেষ কোনো জাতি কিংবা বিশেষ কোনো দেশের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। বরং বিপ্লবের স্বাভাবিক প্রবণতায়ই তা এক বিশ্ব বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। সত্য কখনো ভৌগলিকসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না।। কোনো নদী কিংবা পর্বতের এক দিকে যা সত্য অপর দিকেও তা সত্যরূপে স্বীকৃতি পাবে, এটাই সত্যের চিরন্তন দাবি। মানব জাতির কোনো একটি অংশকেও এ সত্য হতে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। মানুষ যেখানেই যুলুম নিপীড়ন এবং কড়াকড়ি ও বাড়াড়ির পেষণে জর্জরিত হচ্ছে সেখানেই তাদের মুক্তি বিধানের জন্য উপনীত হওয়া ‘সত্যের’ অবশ্য কতর্ব্য। পবিত্র কুরআন একথাই নিম্নলিখিত ভাষায় পেশ করছে।

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

‘তোমাদের কি হয়েছে যে, এসব পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের সাহায্যার্থে তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই কর না, যারা দুর্বল বলে নির্যাতিত হচ্ছে এবং যারা এই বলে প্রার্থণা করে যে, হে আল্লাহ! এই যালেম অধ্যুষিত জনপদ হতে আমাদের মুক্তি দাও।’ (সূরা আন-নিসাঃ ৭৫)

এতদ্ব্যতীত জাতীয় আঞ্চলিক বিভাগ সত্বেও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধ এতো ব্যাপক যে, এর ফলে কোনো একটি রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ কোনো আদর্শ অনুযায়ী পূর্ণরূপে চলা সম্ভব হয় না, যতোক্ষণ না প্রতিবেশী দেশসমূহেও অনুরূপ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব মানব সাধারণের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার সাধন এবং আদর্শ ভিত্তিক আত্মরক্ষার জন্য একটি মাত্র দেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষ্যান্ত না হয়, বরং শক্তি ও সামর্থ অনুসারে উক্ত রাষ্ট্রকে আরো অধিকতর সম্প্রসারণের চেষ্টা করাই একটি ইসলামী দলের প্রধানতম কর্তব্য। তারা একদিকে ইসলামের বিপ্লবী চিন্তাধারা ও মতবাদ প্রচার করবে এবং সকল দেশের অধিবাসীকে গ্রহণ করার আহ্বান জানাবে যেহেতু এটাতেই তাদের প্রকৃত ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং অপরদিকে তাদের শক্তি ও সামর্থ থাকলে অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে উহার মূল্যোচ্ছেদ করবে এবং তার পরিবর্তে ইসলামের সর্বাত্মক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে।

বস্তুত হযরত নবী করীম (সা) এবং তার পরে খোলাফায়ে রাশেদীন এ পন্থায় কাজ করেছেন। ইসলামী দলের অভ্যুত্থান কেন্দ্র আরব দেশকেই সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভাবাধীন করে নেয়া হয়। অতপর নবী করীম (সা) পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রাষ্ট্রনায়ক ও জনগণকে ইসলামের বিপ্লবী আদর্শ ও নীতি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ঐসব দেশের শাসকগোষ্ঠী ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেন। এজাতীয় যুদ্ধগুলোর মধ্যে তাবুকের যুদ্ধ হচ্ছে প্রথম। নবী করীম (সা)-এর পর হযরত আবু বকর (রা) মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি রোম ও ইরান এই দুই অনৈসলামী রাষ্ট্রের উপর একই সংগে আক্রমণ করেন আর হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সময় এ আক্রমণ সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। মিসর, সিরিয়া, রোম ও ইরানের জনগণ প্রথমত ইহাকে আরবের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে মনে করেছিল। সাধারণত এক জাতি অপর জাতিকে দাসানুদাসে পরিণত করার জন্যে যেরূপ আক্রমণ করে থাকে আরবদের এ আক্রমণকেও তারা তদনুরূপ পদক্ষেপ বলে মনে করেছিল। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা কাইসার ও কিসরার পতাকাতলে সমবেত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে তারা মুসলিম দলের বিপ্লবী আদর্শের সাথে পরিচিত হলো। তারা নিঃসন্দেহে বুঝলো যে, তারা অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক জাতীয়তাবাদের (aggressive nationalism) নিশানবরদার নয়, বরং তারা আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে এক সুবিচার ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই অগ্রসর হয়েছে এবং কাইসার ও কিসরার বেশে অত্যাচারী শ্রেণীসমূহের প্রতিষ্ঠিত যে প্রভুত্ব জনগণকে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করছে এটাকে নির্মূল করাই এ আক্রমনের উদ্দেশ্য। এই তত্ত্ব অনুধাবন করার সংগে সংগে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অধিবাসীগণের নৈতিক সমর্থন মুসলিম দলের অনুকূলে এসে পড়লো। ফলে তারা ধীরে ধীরে ‘কাইসার’ ও ‘কিসরার’ দল হতে বিচ্ছিন্ন হতে লাগলো। তাদেরকে জোরপূর্বক সৈন্য বাহিনীতে শামিল করা হলেও লড়াইয়ের ব্যাপারে তাদের আর আন্তরিকতা থাকতো না। বস্তুত একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের ঐতিহাসিক ও বিস্ময়কর দেশ জয়ের মূলে এটাই হচ্ছে অন্যতম প্রধান কারণ। এজন্যই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভের পর ইসলামের সমাজ ব্যবস্থাকে বাস্তবে চালু ও কার্যকর হতে দেখে তারা বিশেষভাবে মুগ্ধ হয় এবং ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে তারা এ আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলের অন্তর্ভূক্ত হতে শুরু করে। আর অপরাপর দেশসমূহেও অনুরূপ বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা এই বিপ্লবী আদর্শের ধারক ও বাহকে পরিণত হয়।

আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক জিহাদের শ্রেণীবিভাগ অবান্তর উপরের আলোচনা সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে অতি সহজেই বুঝা যাবে যে, ‘আক্রমণাত্মক’ (aggressive) ও ‘আত্মরক্ষামূলক’ (defensive) প্রভৃতি আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী ইসলামী জিহাদকে কিছুতেই বিভক্ত করা যায় না। অবশ্য জাতীয় এবং আঞ্চলিক যুদ্ধসমূহকে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে। কারণ পরিভাষা হিসেবে ‘আক্রমণ’ ও ‘প্রতিরোধ’ প্রভৃতি শব্দ একটি দেশে কিংবা একটি জাতি সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো আন্তর্জাতিক (মর্যাদাসম্পন্ন) দল যদি একটি সর্বাত্মক ও বিশ্বব্যাপক মতাদর্শ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে মানুষ হিসেবেই তা গ্রহণ করার জন্য আহবান জানায় এবং প্রত্যেক জাতি হতে আগত লোকদেরকে সমান মর্যাদা সহকারে নিজেদের আদর্শের ভিত্তিতেই নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে, তবে সে ক্ষেত্রে পারিভাষিক ‘আক্রমণ’ ও ‘প্রতিরোধের’ কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। উপরন্তু পরিভাষার কথা বাদ দিলেও ইসলামী জিহাদকে ‘আক্রমাণাত্মক’ ও ‘প্রতিরোধমূলক’- এ দু’ভাগে বিভক্ত করা কোনো মতেই সংগত নয়। কারণ ইসলামী জিহাদে একই সংগে এ উভয় প্রকার কাজ সম্পন্ন হতে দেখা যায়। বিরোধী মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার কারণে উহা আক্রমণাত্মক। আবার নিজ আদর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করতে বাধ্য বলে তা প্রতিরোধমূলক। কিন্তু একটি দল হওয়ার কারণে, তার এমন কোনো ঘর-বাড়ি নাই যার প্রতিরোধ করতে হবে। ইহার নিকট আদর্শই হচ্ছে একমাত্র সম্পদ। এ আদর্শ রক্ষার জন্যই তার আপ্রাণ চেষ্টা এবং সাধনা। অনুরূপভাবে তারা বিরোধী দলের ঘর-বাড়ির উপরেও কখনো আক্রমণ করে না, আক্রমণ করে তার আদর্শ-নীতি ও কর্মপন্থার উপর। উপরন্তু জোরপুর্বক তার নিকট হতে আদর্শ কেড়ে নেয়াও এ আক্রমণের লক্ষ্য নয়, বরং তার আদর্শের হাত হতে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেয়ার জন্যই এ আক্রমণ হয়ে থাকে।

যিম্মীদের অবস্থা

ইসলামী হুকুমাতের অধীনে বিপরীত আদর্শ ও আকীদায় বিশ্বাসী এবং অনুসারীদের অবস্থা কি হয়ে থাকে প্রসংগত তাও উপরের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে। বস্তুত ইসলামী জিহাদ জনগণের আকীদা-বিশ্বাস এবং তাদের ধর্মীয় উপাসনা ও সামাজিক নিয়ম-নীতির উপর কখনও হস্তক্ষেপ করে না। আকীদা, ধর্মবিশ্বাস ও মতাদর্শের ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কোনো আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার কাকেও দিতে ইসলাম প্রস্তুত নয়। উপরন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক ও সমষ্টিগত কল্যাণ বিরোধী নিয়ম-নীতি অনুযায়ী সামগ্রীক কার্য সম্পাদনের কোনো অনুমতিই ইসলামী হুকুমাতে দেয়া যেতে পারে না। ইসলামী হুকুমাত রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ব করেই সকল প্রকার সূদী কারবার বন্ধ করে দেবে। জুয়া খেলার অনুমতি কিছুতেই দেয়া হবে না ; ক্রয়-বিক্রয় অর্থনৈতিক আদান-প্রদান যেসব নিয়ম-পন্থাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে তা সবই বন্ধ করে দেয়া হবে। বেশ্যালয় ও অশ্লীলতার

যাবতীয় কেন্দ্র চুরমার করে দেয়া হবে। এমন কি অমুসলিম নারীগণকে ‘সতরে’র (অংগ আবৃত করা) নিম্নতম সীমা রক্ষা করে চলতে বাধ্য করা হবে। উলংগ ও অশ্লীল এবং প্রকাশ্যভাবে নগ্নতার সমর্থক রীতিসমূহ নির্মূল করা হবে। সিনেমা নিয়ন্ত্রিত করা হবে এবং উহার নৈতিকতা বিরোধী সকল অংশ ও ভাবধারা দূর করা হবে। সহ শিক্ষা প্রচলনের অনুমতি কাকেও দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে ইসলামী হুকুমাতকে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে হবে, যা অমুসলিমদের দৃষ্টিতে অসংগত না হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। কেবল সামাজিক কল্যাণ ও মংগল বিধানের জন্য নয়, আদর্শের দিক দিয়ে আত্মরক্ষার (self defence) জন্যও ইহাকে এরূপ করতে হবে। এপর্যায়ে কেউ যদি ইসলামের বিরুদ্ধে অনুদারতার অভিযোগ উত্থাপন করে, তবে তাকে একটি বিষয় চিন্তা করতে বলবোঃ ইসলাম এর বিরোধী অন্যান্য ধর্মমতের সাথে যতোখানি উদার ব্যবহার করে দুনিয়ার কোনো বিপ্লবী ও সংস্কারবাদী আদর্শই তা করতে প্রস্তুত নয়। বরং অন্যান্য সমস্ত সমাজেই দেখা যায় বিরোধী আদর্শের অনুগামীদের জীবন নানাভাবে জর্জরিত ও দুঃসহ করে তোলা হয়েছে। এমনকি অত্যাচারের নিষ্পেষণে বিড়ম্বিত হয়ে তাদের কতো লোক যে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ইসলাম তার বিরোধী মতাবলম্বীদেরকে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে সকল প্রকার উন্নতি লাভের সুযোগ দিয়ে থাকে। ইসলাম সকল শ্রেণীর অমুসলিমদের সাথে যে ধরনের উদার ব্যবহার করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও তার তুলনা পাওয়া যায় না।

সাম্রাজ্যবাদের সন্দেহ

এপর্যন্ত পৌঁছে আমাকে আবার বলতে হচ্ছে যে, ইসলাম কেবল আল্লাহর পথে কৃত সাধনাকেই ‘জিহাদ’ নামে অভিহিত করে এবং এরূপ জিহাদের ফলে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হলেও সেখানে কাইসার ও কিসরার অনুরূপ আচরণ অবলম্বন করে দ্বিতীয় খোদা হয়ে বসা মুসলমানদের পক্ষে আদৌ বৈধ নয়, ব্যক্তিগত শাসন কায়েম করার জন্য, মানুষকে নিজের দাসানুদাসে পরিণত করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমলব্ধ ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে লুটিয়া নিয়ে নিজের লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ লাভ করার জন্য কোনো মুসলমান যুদ্ধ করে না, আর মুসলিম হওয়ার কারণেই এজন্য সে লড়াই করতেও পারে না। কারণ এই ধরনের জিহাদ ‘আল্লাহর পথে’ হয় না, হয় ‘তাগুতের পথে’। এপথে কোনো সরকার কায়েম হলে ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। মূলত ইসলামের জিহাদ একটি নিরস ও স্বাদহীন শ্রম মাত্র। তাতে জান-মাল এবং লালসার কুরবানী ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ জিহাদ সাফল্যমন্ডিত হলে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ব হলে সত্যিকার মুসলিম শাসকদের দায়িত্বানুভূতি অত্যন্ত তীব্র হয়ে পড়ে। এমন কি, বেচারাদের রাত্রের নিদ্রা এবং দিনের বিশ্রাম পর্যন্ত শেষ হয়ে পড়ে। কিন্তু এর বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতালব্ধ কোনো সুযোগ-সুবিধা কিংবা আয়েশ-আরাম করতে পারে না। অথচ এসব ভোগ করার জন্যই অনেকে সাধারণত রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে থাকে। ইসলামের শাসক প্রজা সাধারণ হতে উর্ধ্বে অবস্থানকারী কোনো বিশিষ্ট সত্তা নয়, বিশেষ ধরনের কোনো আসনেও সে বসতে পারে না, সে নিজের সম্মুখে অপর লোকদের অবনত করতে পারে না, শরীয়াতের আইনের বিপরীত নিজের ইচ্ছা মতো সামান্যতম কাজও সে করতে পারে না। নিজেকে ও নিজের আত্মীয়বর্গকে সে কোনো নিম্নতম ব্যক্তি সংগত দাবি পূরণের দায়িত্ব হতে নিষ্কৃতিও দিতে পারে না। ন্যায্য পাওনা ব্যতীত সে একটি কণা পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারে না, এক বিন্দু জমিও সে নাজায়েযভাবে দখল করতে পারে না। মধ্যম ‘মান’ অনুযায়ী জীবন যাপনের উপযোগী বেতনের অধিক একপাই পরিমাণ অর্থও বায়তুলমাল হতে গ্রহণ করা তার পক্ষে হারাম। ইসলামী হুকুমাতের শাসনকর্তা কোনো রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করতে পারে না।

বিলাস-ব্যাসনের সরঞ্জাম গ্রহণ করাও তার পক্ষে নিষিদ্ধ। তার জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের চূড়ান্ত ও পুংখানুপুংখ হিসেব নেয়া হবে এ আতংকেই বেচারা প্রতিটি মুহুর্তে কাতর হয়ে থাকে। কারণ তার সন্দেহাতীত বিশ্বাস এই যে, হারাম উপায়ে উপার্জিত একটি পয়সা, জোরপূর্বক দখলকৃত এক টুকরা জমি, একবিন্দু অহংকার ও ফিরাউনী চাল, অত্যাচার ও অবিচারের একটি ঘটনা এবং লালসা চরিতার্থের একটু ইচ্ছাও তার আমলনামায় প্রমাণিত হলে পরকালে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি প্রকৃতই নিজের বৈষয়িক সুবিধা লাভের জন্য লোভাতুর হয়ে ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা করে, তবে বলতেই হবে যে, তার তুলনায় নির্বোধ আর কেউ হতে পারে না। কারণ ইসলামী হুকুমাতের রাষ্ট্রপ্রধান অপেক্ষা বাজারে একজন সাধারণ দোকানদারের অবস্থা অনেক ভালো হয়ে থাকে। দিনের বেলা সে নিশ্চিন্তে পা মেলে ঘুমাতে পারে। কিন্তু খলিফা বেচারা না তার সমপরিমাণ উপার্জন করতে পারে, আর না পারে রাতের বেলা পরম তৃপ্তিতে নিদ্রায় অচেতন হতে। তার অবস্থা সত্যিই সহানুভূতির উদ্রেক করে।

বস্তুত এটাই হচ্ছে ইসলামী হুকুমাত ও অনৈসলামী হুকুমাতের মৌলিক পার্থক্য। শেষোক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসকগণ লোকদের উপর স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করে থাকে এবং দেশের উপায়-উপাদান ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকগণ শুধু খেদমত-ই করে থাকে, জনসাধারণের অপেক্ষা অধিক কিছুই সে নিজের জন্য গ্রহণ করেন না। ইসলামী রাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিসের জন্য নির্দিষ্ট বেতনের সাথে বর্তমান কালের কিংবা সেকালের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের অনুরূপ কাজের বেতনের হারের তুলনা করলে ইসলামের বিশ্বজয় এবং সাম্রাজ্যবাদের রাজ্যগ্রাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ইসলামী রাষ্ট্রে খোরাসান, ইরাক ও মিশরের শাসনকর্তাদের বেতন একালের সাধারণ পুলিশ ইন্সপেক্টরের বেতন অপেক্ষা অনেক কম ছিলো। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) মাসিক মাত্র একশত টাকা বেতনে এতবড় রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করতেন। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর বেতন মাসিক দেড়শত টাকার অধিক ছিলো না। অথচ তখন ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল তদানীন্তন দু'টি রাষ্ট্রের ধন সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সম্রাজ্যবাদ দেশ জয় করে এবং ইসলামও দেশ জয় করে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। কবির ভাষায়ঃ

''যদিও উভয়ে উড়ে একই শূন্যলোক

শকুন ও বাজের রাজ্যে বহু ব্যবধান।''

বস্তুত এটাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের মুল কথা। অথচ এটার সম্পর্কে কতোই না বিরূপ কথাবার্তা আকাশ বাতাস মথিত করে তুলেছে। কিন্তু ইসলাম, মুসলিম দল এবং জিহাদের এ নির্মল ধারণা বর্তমান সময়ে কোথায় লুকিয়ে রয়েছে তা জিজ্ঞেস করলে এবং বর্তমান পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে তার একবিন্দু পরিমাণ লক্ষণ না থাকার কারণ জানতে চাইলে, আমিই বলবো এ প্রশ্ন আমার নিকট কেন করা হচ্ছে? যারা মুসলিম জাতির দৃষ্টি তার আসল কাজ হতে ফিরায়ে তা'বীয, তুমার, মুশাহিদা ও মোরাকিবার কৃচ্ছ্রসাধনার দিকে আকৃষ্ট করেছে, যারা পারলৌকিক মুক্তি এবং ইহলৌকিক কল্যাণ ও উদ্দেশ্য লাভের অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ দেখিয়েছে, এ প্রশ্ন আজ তাদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত। কারণ তারাই তো বলেছে যে, চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম ব্যতীত শুধু তাসবীহ পাঠ কিংবা কবরস্থ কোনো 'বড়পীর' সাহেবের অনুগ্রহ হলেই দুনিয়ার সবকিছুই করায়ত্ত হতে পারে। তারাই তো ইসলামের মূল ও বুনিয়াদী নীতি আদর্শ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বিস্মৃতির অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। সশব্দে কি নিঃশব্দে 'আমীন' বলা 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করা এবং ইসালে সওয়াব ও যিয়ারতের ন্যায় নিতান্ত খুঁটিনাটি ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে মুসলিম জাতিকে বিজড়িত করেছে। ফলে মুসলিম জাতি আত্মবিস্মৃত হয়েছে, বিস্মৃত হয়েছে ইসলামের মূল কথাকে, ভুলিয়েছে নিজের মূল উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে। তাদের দিক হতেও যদি সঠিক উত্তর না পাওয়া যায়, তবে এ প্রশ্ন দেশের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ও শাসনকর্তাদের নিকটেই পেশ করে দেখুন। কারণ তারা কুরআন মজীদ ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার দাবি করে বটে, কিন্তু কুরআনের আইন অনুযায়ী জীবন যাপন ও রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো কর্তব্যই তারা পালন করে না, যদিও কখনও কুরআন 'খতম' করানো ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে সভার অনুষ্ঠান করা এবং কুরআনের সাহিত্যের গুণ-গান করার কিছু না কিছু কাজ তারা নিশ্চয়ই করে। মনে হয় কুরআনের আইন ও হযরতের বিধানকে কার্যত জারি করা সম্পর্কে এদের যেনো কোনো দায়িত্ব নেই। এটার মূল কারণ এই যে, তাদের 'নফস' ইসলামের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে এবং তার দায়িত্ব পালন করতে আদৌ প্রস্তুত নয়, বরং একান্ত সহজভাবেই মুক্তি লাভ করতে চায়।